অধ্যায় ঃ ২

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ধারাবাহিকতা ঃ যুক্তিবাদের পরম্পরা

প্রাচীনকাল থেকেই বহু গবেষণার ফলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। জনশ্রুতি অনুসারে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা লক্ষ শ্লোকময়ী আয়ুর্বেদশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। পরে মানুষের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে তিনি আয়ুর্বেদকে সংক্ষিপ্ত করে 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ' রচনা করেন। এই আটটি অঙ্গ হল কায়তন্ত্র (ঔষধবিদ্যা), শল্যতন্ত্র (অস্ত্রচিকিৎসা), শালাক্যতন্ত্র (চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা সংক্রান্ত), কৌমারভৃত্যতন্ত্র (শিশুরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ক), ভূততন্ত্র (মানসিক রোগ), অগদতন্ত্র (বিষবিদ্যা), রসায়নতন্ত্র (রসায়নবিদ্যা) এবং বাজীকরণতন্ত্র (জনন সংক্রান্ত)। ব্রহ্মা এই জ্ঞান প্রথমে অশ্বিনীকুমারদের এবং অশ্বিনীকুমাররা ইন্দ্রকে দান করেন। পরবর্তীকালে আর্যরা সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করলে গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ুতে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য হিমালয়ের পাদদেশে চৈত্ররথ বনে প্রথম ঋষিসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের কাছ থেকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করলে মর্ত্যে আয়ুর্বেদের শুভ সূচনা হয়।[১] এরপর দ্বিতীয় ঋষিসম্মেলনে ভরদ্বাজের কাছ থেকে পুনর্বসু আত্রেয় এবং ধন্বন্তরি যথাক্রমে কায়তন্ত্র এবং শল্যতন্ত্র বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তীকালে আত্রেয় তাঁর ছয়জন শিষ্যকে যেমন - অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণিকে কায়তন্ত্র সম্পর্কে এবং ধন্বন্তরি তাঁর শিষ্যদের যেমন সুশ্রুত, ঔপধেনব, ঔরভ্র, পুষ্কলাবত ও গোপুর রক্ষিতকে শল্যতন্ত্র বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলেন। শিক্ষান্তে আত্রেয় ও ধন্বন্তরির সব শিষ্যই একটি করে সংহিতা রচনা করেন। কিন্তু এগুলির মধ্যে 'অগ্নিবেশ সংহিতা' ও 'সুশ্রুত সংহিতা' সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়। পরবর্তীকালে অগ্নিবেশ সংহিতা চরক ও দৃঢ়বল কর্তৃক সংস্কৃত ও প্রতিসংস্কৃত হয়ে 'চরক সংহিতা' নামে বিখ্যাত হয়েছে। সুশ্রুত সংহিতা কনিষ্ঠ সুশ্রুত ও নাগার্জুন দ্বারা সংস্কৃত ও প্রতিসংস্কৃত হয়ে 'সুশ্রুত সংহিতা' নামে পরিচিত হয়। এছাড়া মহর্ষি ভরদ্বাজের কাছে শিক্ষা নেন শালাক্যতন্ত্রে — বিদেহ,নিমি, কঙ্কায়ন ও গালব; কৌমারভৃত্যতন্ত্রে জীবক, পাবর্তক, বন্ধক ও হিরণ্যাক্ষ; অগদতন্ত্রে — কাশ্যপ, সনক, শৌনক ও লাট্যায়ন; রসায়নতন্ত্রে — সাধন, ব্যাড়ি, বশিষ্ঠ ও মান্ডব্য; বাজীকরণতন্ত্রে -কুচুমার, অগস্ত্য, কৌপালিক প্রমুখ। [২]

যুক্তিবাদী আয়ুর্বেদের সূচনা চরক ও সুশ্রুতের গ্রন্থসমূহের মধ্য দিয়ে হয়েছিল বলা যায়।[৩] চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতার সঠিক রচনাকাল, রচয়িতা প্রভৃতি বিষয়ে পন্ডিতদের

মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য বিদ্যমান। প্রসিদ্ধ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সিলভা লেভি পঞ্চম শতাব্দীর চীনা ত্রিপিটকে চরক নামে জনৈক চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর উল্লেখ পেয়েছেন। তিনি ছিলেন শক বংশীয় নরপতি কনিষ্কের গুরু। এর ভিত্তিতে লেভি চরককে কনিষ্কের সমসাময়িক এবং খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের বলে মনে করেছেন।[৪] কিন্তু চারশত বছর পরের চৈনিক গ্রন্থে ভুল থাকা অসম্ভব নয়। তাছাড়া কনিষ্কের সভায় চরক নামধারী একজন চিকিৎসকের অবস্থিতি থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, তিনিই চরক সংহিতার প্রণেতা বিখ্যাত চরক। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লেভির মত খন্ডন করেছেন। পাণিনির রচনায় চরকের উল্লেখ আছে। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে পতঞ্জলি চরক সংহতির টীকা প্রণয়ন করেছিলেন। এসব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে প্রফুল্লচন্দ্র রায় চরককে বৌদ্ধ-পূর্ববর্তী যুগের লোক মনে করেন। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, সুশ্রুত সংহিতার ন্যায় চরক সংহিতার রচনাপ্রণালী সুসংবদ্ধ ও সাবলীল নয়। চরক সংহিতায় নানা অংশে অনেক অবাস্তব ও অসংলগ্ন বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। স্থানে স্থানে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের অভাব দার্শনিক আলোচনার সাহায্যে গোপন করার প্রয়াস চরকে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। সুশ্রুত এই দোষ থেকে বহুলাংশে মুক্ত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্তমানের ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকে যেরূপ সুসংবদ্ধ ও সুলিখিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়, চরকের মূলগ্রন্থে এগুলি তেমন ছিল না। চরকোক্ত ন্যায় ও বৈশেষিকবাদ পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তখন এই দার্শনিক মতবাদের শুধুমাত্র সূচনা হয়েছিল। চরকের প্রাচীনত্বের এটিও একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বেদোক্ত দেবতা এবং বৈদিক মন্ত্র ব্যতীত কোনো পৌরাণিক কাহিনী চরকে সংকলিত হয়নি। মানবদেহের অস্থিসংখ্যা নির্ণয়ে চরক বৈদিক মতবাদই অনুসরণ করেছেন এবং ত্রিশ বছর পর্যন্ত মানুষের শৈশব বলে স্থির করেছেন। চরকের মতে মানবদেহ ৩৬০টি অস্থির সমন্বয়ে গঠিত। জোলির মতে চরকের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতে হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রে চরককেই প্রথম সুলিখিত গ্রন্থ বলে উল্লেখ করলে ভুল করা হবে। পাণিনি যেমন যাস্ক, সাকল্য, শাকটায়ন, গার্গ এবং অন্যান্য পূর্ববর্তী প্রায় চল্লিশটি ব্যাকরণের সুলিখিত শেষ পরিণতি, চরক সংহিতাও তেমনই তার পূর্ববর্তী নানাবিধ আয়ুর্বেদ গ্রন্থের সুচিন্তিত ও সুলিখিত পরিণত সংস্করণ। এছাড়া চরক সংহিতার ভাষার বৈশিষ্ট্যও এর প্রাচীনত্ব প্রমাণে একটি বিশিষ্ট উপাদান। চরক সংহিতার ভাষার সঙ্গে বেদের ব্রাহ্মণের ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অথর্ববেদ ও চরকের মধ্যবর্তীকালে নিশ্চয়ই যুগোপযোগী চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছিল। এমনকি চরকের সময়েই অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারীত এবং ক্ষারপাণি প্রণীত ছয়খানি প্রামাণিক আয়ুর্বেদ গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। অগ্নিবেশের গ্রন্থটিকে ভিত্তি করেই চরক তাঁর সংহিতা রচনা করেন। অর্থাৎ অগ্নিবেশের গ্রন্থখানিকে আমূল সংস্কার করেই

চরক সংহিতার উদ্ভব হয়। মনোযোগের সঙ্গে চরক সংহিতা পাঠ করলে মনে হয় যে, এটি যেন একটি আন্তর্জাতিক চিকিৎসকমণ্ডলীর কোনো একটি বিশেষ সম্মিলনীর কর্মবিবরণী ও আলোচনা। জে. ফিলিওজাট চরক সংহিতার রচনাকারকে কনিষ্কের সময়কালের চরক অপেক্ষা প্রাচীনতর ব্যক্তি বলে মনে করেন। [৬]

চরকের সময়কাল বর্ণনা প্রসঙ্গে আরো বলা যায় যে, কনিষ্কের রাজসভায় অশ্বঘোষ, বসুমিত্র, নাগার্জুন প্রমুখের বিশেষ প্রভাব ছিল। চরকসংহিতার রচয়িতা কনিষ্কের রাজবৈদ্য হলে তাঁর দ্বারা প্রতিসংস্কৃত গ্রন্থে সমসাময়িক ব্যক্তিদের লিখিত বা চর্চিত বিষয়সমূহের অথবা তৎকালে প্রচলিত বিষয় বা ভাবসমূহের উল্লেখ থাকত। কিন্তু তা না থাকায় আভ্যন্তরিক প্রমাণের অভাবে কনিষ্কের রাজবৈদ্য চরকই যে চরক সংহিতার রচয়িতা তা বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বিনষ্ট অগ্নিবেশ সংহিতার প্রতিসংস্কর্তা একজন না বহুজন এবং এটি দৃঢ়বল কর্তৃক পরিপূরিত হওয়ার পূর্বে একবার না বহুবার বহু ব্যক্তির দ্বারা প্রতিসংস্কৃত হয়েছিল, তা সঠিকভাবে জানার কোনো উপায় নেই। চরক সংহিতার ব্যাখ্যাকর্তারা মহর্ষি পতঞ্জলিকে অগ্নিবেশ সংহিতার আদি প্রতিসংস্কর্তা স্থির করেছেন। একথা স্বীকার করতে হবে যে, পতঞ্জলি থেকে দৃঢ়বলের সময় পর্যন্ত আরো অনেক প্রতিসংস্কর্তা চরক নামে চরক সংহিতার প্রতিসংস্কার বা পুনর্লেখন কার্য করেছিলেন। ফলে তাঁদের লিখিত সংহিতায় বহু বিষয় প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল। পতঞ্জলি কর্তৃক প্রতিসংস্কৃত হওয়ার পরেও চরক সংহিতা পুনরায় কার্লাক ভক্ষিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ পরিব্রাজক সন্ন্যাসী চিকিৎসকদের দ্বারা প্রতিসংস্কৃত হয়ে খণ্ডিত ও বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। চরক সংহিতার চিকিৎসিত স্থানের শেষ সপ্তদশ অধ্যায় এবং সম্পূর্ণ কল্পস্থান ও সিদ্ধিস্থান বিনষ্ট হওয়ায় দৃঢ়বল (খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক) তার প্রতিসংস্কার করেন। অর্থাৎ যে বৈদ্যক গ্রন্থ 'চরক সংহিতা' নামে বিখ্যাত তার কর্তা অগ্নিবেশ, প্রতিসংস্কর্তা চরক এবং পরিপূরক দৃঢ়বল।[৭]

চিকিৎসাগ্রন্থ হিসাবে চরক সংহিতা আজও সমাদৃত। অধুনা উপলব্ধ চরক সংহিতায় আটটি স্থান বা বিভাগ এবং একশত কুড়িটি অধ্যায় বিদ্যমান। অধ্যায়গুলি নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত। যথা- সূত্রস্থান ত্রিশ অধ্যায়, নিদানস্থান আট, বিমানস্থান আট, শরীরস্থান আট, ইন্দ্রিয়স্থান বারো, চিকিৎসাস্থান ত্রিশ, কল্পস্থান বারো এবং সিদ্ধিস্থান বারোটি অধ্যায় নিয়ে গঠিত।

চরক সংহিতার থেকে সুশ্রুত সংহিতা অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভাষার লালিত্যের দিক থেকে বিচার করতে গেলে সুশ্রুতকে বরং শুষ্ক, সারগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। এজন্য সুশ্রুতকে চরক অপেক্ষা আধুনিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে। [৮] বর্তমানে সুশ্রুত সংহিতা নামক যে গ্রন্থ পাওয়া যায়, তা ধন্বন্তরির শিষ্য সুশ্রুত প্রণীত সংহিতা গ্রন্থ নয়। কারণ গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার সুশ্রুতকে নমস্কার জানিয়েছেন। এ থেকে মনে হয় যে, সুশ্রুত ভিন্ন

অন্য কোনো ব্যক্তি এই গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। সুশ্রুত সংহিতার টীকাকার ডল্বণাচার্য 'নিবন্ধ সংগ্রহ' - এ বলেছেন যে, লভ্যমান সুশ্রুত সংহিতা 'সৌশ্রুত তন্ত্রম্' থেকে পৃথক এবং সৌশ্রুততন্ত্রম্ বিনষ্ট হলে নাগার্জুন এর প্রতিসংস্কার করেন। [৯] আচার্য রায় দেখিয়েছেন যে, মহাভারতের সভাপর্বে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ এবং অন্যত্র সুশ্রুতের উল্লেখ আছে। সুতরাং মহাভারতের সময়ে সুশ্রুত গ্রন্থ বিদ্যমান থাকা সম্ভব। বর্তমান সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রে আছে যে, বিশ্বামিত্র তনয় মহর্ষি সুশ্রুত ধন্বন্তরিকে জিজ্ঞাসা করছেন। বেদসূক্তকার বিশ্বামিত্র পাণিনিসূত্রে বিশ্বের মিত্র বলে ব্যুৎপাদিত। বিশ্বামিত্র অতি প্রাচীন ঋষি ও রামায়ণের প্রমাণানুসারে শ্রীরামের শিক্ষাগুরু। রাজশেখর প্রণীত বালরামায়ণের প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্য লাভের পূর্বে তাঁর সুশ্রুত নামক পুত্র জন্মায় এবং তিনিই চিকিৎসাগ্রন্থ রচনা করেন। বিশ্বামিত্র ছিলেন শ্রীরামের সমকালবর্তী। বালরামায়ণ পাঠে দেখতে পাই যে, শ্রীরামতনয় কুশ সুশ্রুতকে কুশাবতী (কুশস্থলী) রাজ্য দিয়েছিলেন। অর্থাৎ সুশ্রুত কুশের সমকালবর্তী। আবার বর্তমান সুশ্রুতের চিকিৎসাস্থানে শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লিখিত হয়েছে। শ্রীরাম, বিশ্বামিত্র ও কুশের অনেক পরে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। অতএব আদিম সুশ্রুত গ্রন্থ নাগার্জুন ভিন্ন অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পুনঃসংস্কৃত হওয়ার পর তাতে শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা ও তেজের বিষয় যে বিবৃত হয়েছে তা অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। কারণ যে বচনে মহেন্দ্র (দেবরাজ ইন্দ্র), রাম, কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণ ও গোজন্তুর তেজ ও তপস্যার কথা লিখিত হয়েছে, সেটি যদি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নাগার্জুন সুশ্রুতে সংযোজিত করতেন, তাহলে মহাতপস্বী ভুবনবিখ্যাত মহাত্মা শাক্যসিংহের তপস্যা ও তেজের বিষয় তাতে বিবৃত থাকা নিতান্ত সম্ভবপর হত। অর্থাৎ সুশ্রুত সংহিতাও যে অগ্নিবেশ তন্ত্রের ন্যায় অন্য কোনো হিন্দু ঋষি কর্তৃক পুনঃসংস্কৃত হওয়ার পর পুনরায় নাগার্জুন কর্তৃক সংস্কৃত হয়েছিল তা অনুমান করা যায়। আচার্য রায় রাজতরঙ্গিনী থেকে দেখিয়েছেন যে, নাগার্জুন কাশ্মীরদেশীয় একজন মণ্ডলেশ্বর রাজা, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মুনি। তিনি শাক্যসিংহের নির্বাণ লাভের দেড়শ' বছর পরে জীবিত ছিলেন। ইনি সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা হলে বর্তমান সুশ্রুতও ২৪০০ বছরের পুরানো গ্রন্থ। প্রতিসংস্কৃত যে সুশ্রুত পুনর্বার প্রতিসংস্কৃত হয়েছে, সেই সুশ্রুত যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ তা সহজেই অনুমান করা যায়। [১০]

Hoernle মনে করেন যে, বাওয়ার পাণ্ডুলিপিতে সুশ্রুতকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।[১১] ম্যাকডোনেলের মতেও সুশ্রুতের লেখনভঙ্গী বাওয়ার পাণ্ডুলিপির ভাষার সঙ্গে বিশেষ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই তিনি মনে করেন যে, সুশ্রুত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে জন্মেছিলেন। আবার এ.এফ. রুডলফ হেসলার খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক এবং গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় খ্রীঃ পূঃ এক সহস্র বছর পূর্বে সুশ্রুতের আবির্ভাব নির্ণয় করেছেন। [১২]

সুশ্রুত সংহিতা মোট ছয়টি বিভাগে বিভক্ত। যথা - সূত্রস্থান, নিদানস্থান, শারীরস্থান, চিকিৎসিতস্থান, কল্পস্থান এবং উত্তরতন্ত্র। এগুলিতে যথাক্রমে ৪৬, ১৬, ১০, ৪০, ৮ এবং ৬৬টি অধ্যায় আছে। উত্তরতন্ত্র হল শালাক্যতন্ত্র, কৌমারভৃত্যতন্ত্র ও ভূতবিদ্যা বিষয়ক অনুপূরক অংশ।[১৩] সুশ্রুত সংহিতার বিষয় সন্নিবেশ ব্যবস্থা সুপ্রণালীবদ্ধ। এর শবব্যবচ্ছেদ পূর্বক অঙ্গ বিনিশ্চয়ের উপদেশ; ছেদ্যাদিকর্মে বিদ্যার্থীর যোগ্যতা লাভার্থ যজ্ঞসূত্রীয়োক্ত কর্মপথ শিক্ষা পদ্ধতি; নানাবিধ বিচিত্রাকৃতি শস্ত্রের বর্ণন ও ব্যবহার বিধি; বিবিধ ব্রণবন্ধনের যথার্থ ব্যবহার; ব্রণবন্ধন দ্রব্যাবলী; ব্রণিতের বিশেষ পথ্য নির্দেশ; শস্ত্রোপচারের পূর্ব, মধ্য ও পরবর্তী ব্যবস্থা; মূঢ়গর্ভ, অশ্মরী, অর্শ, অস্থিভঙ্গ, বিদ্রধি প্রভৃতির শস্ত্রোপচার এবং গর্ভ থেকে মাংস নিয়ে কর্ণপালীতে সংযোজন পূর্বক কর্ণপালী বর্দ্ধনের ব্যবস্থা পাঠ করলে বিশ্বাস জন্মে যে, সুশ্রুত সংহিতা রচনাকালে শস্ত্রচিকিৎসা তৎকালোচিত উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল। সুশ্রুত সংহিতার সময়ে এদেশে বিজ্ঞানবিদোচিত তত্ত্বানুসন্ধিৎসা পরিস্ফুট হয়েছিল। তখন আপ্ত অপেক্ষা প্রত্যক্ষ অধিকতর আদৃত হত, শাস্ত্রবচনের থেকে বাস্তব ঘটনা বলীয়ান ছিল।[১৪]

চরক ও সুশ্রুত উভয়েই আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গের আলোচনা করেছেন। সেগুলি হল (ক) শরীর (খ) বৃত্তি অর্থাৎ সঠিক দৈহিক ও নৈতিক আচরণ, (গ) ব্যাধিসমূহের কারণ, (ঘ) বেদনা ও ব্যাধির প্রকৃতি, (ঙ) কর্ম অর্থাৎ চিকিৎসা, (চ) কার্য বা রোগীকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা, (ছ) কাল অর্থাৎ ঋতুর প্রভাবকে স্বীকৃতি দান, (জ) কর্তৃ অর্থাৎ বৈদ্য ও তাঁর পেশাগত প্রয়োজন, (ঝ) করণ অর্থাৎ উপাদান ও যন্ত্রপাতি এবং (ঞ) বিধিবিনিশ্চয় (প্রেসক্রিপশন)।[১৫] মহাবগ্‌গ ইত্যাদি পালি গ্রন্থে জীবর্ককে বুদ্ধদেবের চিকিৎসক বলা হয়েছে। তিনি অত্রেয়ের শিষ্য ছিলেন এবং তক্ষশিলায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন। অর্থাৎ জীবকের সময়কাল খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী নির্ধারণ করা যায়। [১৬]

আত্রেয় সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বাগ্‌ভট তিনটি আয়র্বেদ গ্রন্থের প্রণেতা। সেগুলি হল অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ, অষ্টাঙ্গ-হৃদয় ও রসরত্নসমুচ্চয়। হর্ণেলি প্রমুখ পন্ডিতগণ তিনজন বাগ্‌ভটের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁরা অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ রচয়িতাকে প্রথম বাগ্‌ভট বা বৃদ্ধ বাগ্‌ভট, অষ্টাঙ্গ -হৃদয়কারকে দ্বিতীয় বাগ্‌ভট এবং রসরত্নসমুচ্চয়ের লেখককে তৃতীয় বাগ্‌ভট বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু গণনাথ সেন অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ ও অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ের রচয়িতাকে একই ব্যক্তি বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে রসরত্নসমুচ্চয়ের লেখক পৃথক ব্যক্তি।[১৭] এ প্রসঙ্গে গণনাথ সেন যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তা থেকে তাঁরা যে একই বেদবাদী-সম্প্রদায়ের লোক বা গুরুশিষ্য পরম্পরাগত ছিলেন তা নিঃসন্দেহে মনে করা যায়। উভয়েই মানবদেহে তিনশত ষাটটি অস্থির কথা স্বীকার করেছেন। দুটি গ্রন্থে বহু অধ্যায় হুবহু এক। তবে কিছু ক্ষেত্রে মতভেদও আছে।

যেমন প্রসবান্ত চিকিৎসায় সংগ্রহকার চরকের মতানুসারী, কিন্তু হৃদয়কার সুশ্রুতের মতকে অনুসরণ করেছেন। এছাড়া কোষ্ঠাঙ্গ পরিচয়, সন্ধিবর্ণনা, শিরাবর্ণনা, মর্মবর্ণনায় উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সংগ্রহকার পুস্তকের শেষে আত্মপরিচয় দান করলেও হৃদয়কারের আত্মপরিচয় প্রাচীন মূলগ্রন্থে পাওয়া যায় না। তাই উভয়গ্রন্থের লেখক এক ব্যক্তি কিনা তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না।[১৮] ড. দত্ত দুই জন বাগ্‌ভটের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। প্রথমজন গদ্যে ও পদ্যে এবং দ্বিতীয়জন ছন্দোবদ্ধ রীতিতে রচনা করেছিলেন। [১৯]

বাগ্‌ভটের সময়কাল প্রসঙ্গে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ের রচয়িতাকে ড. কীথ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর এবং হর্ণেলি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক বলে মনে করেছেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে মাধবনিদান আরবীভাষায় অনূদিত হয়। মাধবনিদানে অষ্টাঙ্গ-হৃদয় থেকে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাগ্‌ভটকে মাধবের পূর্ববর্তী লেখক বলা যায়। চৈনিক ভ্রমণকারী ই-সিং বাগ্‌ভটকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের এবং দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বলে মতপ্রকাশ করেছেন। আবার পুণার রামচন্দ্র অষ্টাঙ্গ- সংগ্রহের ভূমিকায় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে বাগ্‌ভট আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে মনে করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীযুক্ত জাহ্নবীচরণ ভৌমিক ও শ্রীমতী অক্ষয়কুমারী দেবী খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতককে বাগভট্টের কাল বলে উল্লেখ করেছেন। [২০]

অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহের উত্তরতন্ত্রে শক নরপতি ও শক নারীদের উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ভারতে শকাধিকার বিলুপ্ত হয়। অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বেই বাগ্‌ভটের জন্ম সূচিত হয়। আবার বাগ্‌ভট বলেছেন যে, চরক থেকে ঊর্দ্ধজত্রুগত অর্থাৎ শিরঃ, শ্রবণ, নয়ন ও বদনগত পীড়ার বিষয়ে জানা যায় না। কিন্তু অধুনাপ্রাপ্ত চরকসংহিতায় এসব রোগের কথা আছে। সম্ভবতঃ দৃঢ়বল এই বিষয়গুলিকে চরক সংহিতায় স্থান দিয়েছিলেন। বাগ্‌ভটের কালে চরক সংহিতায় এগুলির উল্লেখ ছিল না। অর্থাৎ বাগ্‌ভটকে দৃঢ়বলের পূর্ববর্তী বলা যায়।[২১] আবার অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ের উপসংহার থেকে বোঝা যায় যে, বাগ্‌ভটের সময়ে প্রচলিত সুশ্রুত সংহিতায় কাস-শ্বাসাদি পীড়ার চিকিৎসার কথা লিখিত ছিল না। [২২] কিন্তু বর্তমান সুশ্রুত সংহিতায় এই রোগগুলির চিকিৎসাবিধি লিখিত আছে। এই অংশটি নাগার্জুন কর্তৃক লিখিত হলে বাগ্‌ভটকে নাগার্জুনের পূর্ববর্তী বলা যায়।

অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ ছয়টি স্থানে বিভক্ত। যথা — সূত্রস্থান, শারীরস্থান, নিদানস্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান ও উত্তরস্থান। এতে মোট দেড়শতটি অধ্যায় বিদ্যমান। এক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ সংহিতাকার পূর্ববর্তী আয়ুর্বেদাচার্য্যদের মতো সুবিধা অনুসারে কোথাও গদ্যে কোথাও বা পদ্যে লিখেছেন।

কিন্তু তিনি আয়ুর্বেদের দুর্বোধ্য তথ্যসকল আরও সহজভাবে মানুষের কাছে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। অষ্টাঙ্গ-হৃদয় গ্রন্থে বাগ্‌ভট বলেছেন যে, অষ্টাঙ্গ সম্পন্ন বৈদ্যকশাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্র মন্থন দ্বারা প্রাপ্ত অষ্টাঙ্গসংগ্রহরূপ মহামৃতরাশি থেকে পৃথক অষ্টাঙ্গ-হৃদয়তন্ত্র অল্পোদ্যম ব্যক্তিগণের প্রীত্যর্থে উদিত হল।[২৩] অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহে চরক ও সুশ্রুত থেকে বহু উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। অষ্টাঙ্গ-হৃদয় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক বা তার পূর্বে রচিত হলে অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহকে তারও পূর্ববর্তী বলা যায়। [২৪] অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহে কায়চিকিৎসা ও শল্যচিকিৎসা উভয়েরই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু অষ্টাঙ্গ-হৃদয় মূলতঃ শল্যচিকিৎসা ও বেদনানাশের বিষয়ে আলোচনা করেছে। গ্রন্থদুটি থেকে চরক, সুশ্রুতের পরবর্তীকালের চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।[২৫] অষ্টাঙ্গ-হৃদয় অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহের মতোই ছয়টি স্থানে বিভক্ত হলেও অধ্যায় সংখ্যা কমিয়ে একশত কুড়িটি করা হয়েছে। অষ্টাঙ্গ-হৃদয় পদ্য ছন্দে রচিত।

আয়ুর্বেদের পরম্পরা অনুসারে বাগ্‌ভট সূত্রস্থান রচনায় শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ বাগ্‌ভট আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠ সূত্রকার। তাঁর সূত্রস্থান যেমন সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত, চরক ও সুশ্রুতেরও তেমন নয়। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের সূত্র সম্পর্কিত বিষয়গুলি চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় শুধুমাত্র সূত্রস্থানে নিবদ্ধ নয়। কিন্তু বাগ্‌ভট সূত্রসম্পর্কিত সকল বিষয়কেই সূত্রস্থানে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তিনি আয়ুর্বেদ বিষয়ে পূর্ব প্রচলিত মতামতের পাশাপাশি নতুন আবিষ্কারকে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। বাগ্‌ভট পদ্যময়ী আয়ুর্বেদ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে অগ্রজ। মূলতঃ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তী আয়ুর্বেদ গ্রন্থকার যথা - মাধবকর, চক্রপাণি, শার্ঙ্গধর, ভাবমিশ্র প্রমুখ সকলেই রসাত্মক বাক্যে আয়ুর্বেদের বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুগুলি ব্যাখ্যা করেন। বাগ্‌ভটের ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল। চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় কথিত দর্শন শাস্ত্রের জটিল অংশগুলি বাগ্‌ভট যত্নপূর্বক পরিহার করে শিক্ষার্থীদের আয়ুর্বেদ শিক্ষার পথ অধিকতর সুগম করেছেন। [২৬]

বাগ্‌ভটের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য আয়ুর্বেদ গ্রন্থকার হলেন মাধবকর। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এই সময়েই মাধবনিদান রচিত হয়েছিল। কারণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে এই গ্রন্থের আরবী অনুবাদ হয়। তাই অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে মাধবনিদান রচিত হয়েছিল বলে মনে করা সঙ্গত। মাধবকরের লেখা অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল — প্রশ্নসহস্রবিধান বা সুশ্রুত শ্লোকবার্ত্তিক, আয়ুর্ব্বেদরসশাস্ত্র, সটীক কুটমুদ্গর, পর্য্যায় রত্নমালা, যোগব্যাখ্যা, আয়ুর্বেদ প্রকাশ।[২৭] মাধবনিদান গ্রন্থটির প্রকৃত নাম'রোগবিনিশ্চয়'। গ্রন্থটি মাধবকরের শ্রেষ্ঠ রচনারূপে কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় রচয়িতার নামেই খ্যাত হয়েছে।

শাস্ত্রবাক্য অনুসারে নিদান অর্থাৎ রোগবিনিশ্চয়ে মাধবকরের স্থান সর্বোচ্চ। চরক,

সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটে রোগের কারণের সঙ্গে রোগনির্ণয় শাস্ত্রের বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। চরকে আশি রকম বাতজ ব্যাধি, চল্লিশ রকম পিত্তজ ব্যাধি এবং কুড়িরকম কফজ ব্যাধির উল্লেখ থাকলেও এগুলির বিস্তারিত বর্ণনা সেই। মাধব তার অপূর্ব প্রকাশভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক পর্য্যায়বোধের পরিচয়ের দ্বারা মাত্র সপ্তদশ শ্লোকে রোগবিজ্ঞানের যে অপূর্ব ধারা প্রকাশ করেছেন, তা সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন চিকিৎসা বিজ্ঞানে নিদান শাস্ত্রের পথপ্রদর্শক। [২৮] মাধবকর নিজেই বলেছেন যে, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন যারা অতি বিস্তৃত বা দুর্বোধ্য আয়ুর্বেদ গ্রন্থসকল অধ্যয়নে অসমর্থ বা যারা গ্রন্থসম্পদবিহীন তাদের পক্ষে অনায়াসে রোগনির্ণয় করার নিমিত্ত তাঁর গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট উপায় হবে।[২৯]

মাধবকর রোগনির্ণয় করার জন্য পাঁচটি প্রধান উপায়ের উল্লেখ করেছেন — নিদান, পূর্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাতি। নিদান অর্থে রোগের উৎপত্তি যার দ্বারা হয়; পূর্বরূপ বলতে রোগ হওয়ার আগে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় তা বোঝানো হয়েছে। রোগ হলে যে লক্ষণ দিয়ে রোগ চিনতে পারা যায় তাকে রূপ বলা হয়েছে। আবার যা দিয়ে রোগের উপশম হয় তা উপশয় রূপে পরিচিত এবং দোষকুপিত হয়ে যেভাবে রোগ উৎপাদন করে তার আনুপূর্বিক বিবরণ হল সম্প্রাতি। [৩০]

আয়ুর্বেদ বিকাশের শেষ পর্যায় হলো রসায়নতন্ত্রের যুগ। কারণ আয়ুর্বেদের বিভিন্ন সংহিতায় নানাপ্রকার ধাতব, খনিজ ও জান্তব পদার্থ ব্যবহারের নির্দেশ থাকলেও খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ঔষধরূপে লতাপাতারই ব্যবহার বেশী ছিল। কিন্তু নাগার্জুনের পারদকজ্জলী আবিষ্কারের পর থেকে লতাপাতার পরিবর্তে ধাতুঘটিত রসায়নের ব্যবহার ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পরে রচিত সকল আয়ুর্বেদ গ্রন্থেই ধাতুঘটিত রসায়ন ব্যবহারের নির্দেশ আছে। এই ধাতুঘটিত রসায়ন ব্যবহারের সাফল্যে প্রভাবিত হয়ে রসসিদ্ধসম্প্রদায় আত্রেয় সম্প্রদায়কে হীন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী বিবাদের সূত্রপাত হয় এবং এই বিবাদ প্রায় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ষোড়শ শতক থেকে রসসিদ্ধসম্প্রদায় ভেষজ রসায়ন ব্যবহারের নির্দেশ দিলে এই বিবাদের অবসান ঘটে।[৩১] রসায়নতন্ত্র যুগের শেষে শুরু হয় আয়ুর্বেদের সংকলন, অনুবাদ ও টীকাভাষ্য রচনার যুগ।

বৃন্দাবন কুণ্ড বা বৃন্দকুণ্ড ছিলেন খ্রীষ্টীয় নবম শতকের একজন প্রখ্যাত গবেষক চিকিৎসক। তিনি সিদ্ধযোগ, বৃন্দসিন্ধু, গদবিনিশ্চয় নামক বৈদ্যক গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন।[৩২] সিদ্ধযোগে বৃন্দ ৮২টি অধিকারে জ্বর চিকিৎসা থেকে বিষচিকিৎসা পর্যন্ত নানা ব্যাধির চিকিৎসার কথা বলেছেন। তাঁর গ্রন্থের অংশবিশেষের সঙ্গে বাওয়ার পাণ্ডুলিপির মিল দেখা যায়। তাঁর গ্রন্থে বৃংহর্ণ, স্বেদন, বমন, বিরেচন, অরিষ্ট লক্ষণ, স্বাস্থ্যাধিকার ইত্যাদি বিষয় অলোচিত হয়েছে।

মিশ্রকাধিকারে বৃন্দ চিকিৎসক, রোগী, পরিমাপ ও ওজন এবং নানা সাধারণ বিষয় নিয়ে অলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থ সম্পর্কে চক্রপাণির জ্ঞান দেখে মনে করা যায় যে, চক্রপাণির কালে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। শার্ঙ্গধর সংহিতা, বীরসিংহাবলোকসহ বহু গ্রন্থে বৃন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃন্দের রচনায় পারদের ব্যবহারের কথা চক্রদত্তের চেয়ে কম আছে। বৃন্দ তাঁর রচনায় বাগ্‌ভটের উল্লেখ করেছেন। তাই মনে করা যায় যে, বৃন্দ বাগ্‌ভটের পরবর্তীকালে ও চক্রদত্তের পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। [৩৩] বৃন্দ সিদ্ধযোগে এমন কিছু ঔষধের উল্লেখ করেছেন যা চরক, সুশ্রুত বা বাগ্‌ভটে বলা হয়নি। যেমন — জ্বরে চতুর্দ্দশাঙ্গ ও অষ্টদশাঙ্গ ক্বাথ, অঙ্গার তেল; অর্শে প্রণদাগুড়িকা, কাঙ্কায়নমোদক; রাজযক্ষ্মায় ছাগলাদ্যঘৃত; শ্বাসে ভার্গীগুড়; বাতব্যাধিতে নারায়ণ ও মহানারায়ণ তৈল; বাতরক্তে কৈশোর গুগ্গুল; হৃদয়রোগে অর্জুন ঘৃত ও অজ্জনারিষ্ট; কুষ্ঠে পঞ্চতিক্তক ঘৃত, মরিচাদ্য তৈল ইত্যাদি। এ থেকে বোঝা যায় যে, বৃন্দের গবেষণা বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল।[৩৪]

সুশ্রুত সংহিতার বিখ্যাত টীকাকার ছিলেন ডল্বণাচার্য। তাঁর রচিত টীকার নাম 'নিবন্ধ সংগ্রহ'। ডঃ কীথ প্রমুখ ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদগণ তাঁকে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের বলে অনুমান করেন। কিন্তু একাদশ শতকে আবির্ভূত চক্রপাণি ডল্বণের 'নিবন্ধ সংগ্রহ' থেকে পাঠোদ্ধার করেছিলেন। সুতরাং ডল্বণ চক্রপাণির পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক ছিলেন বলা সঙ্গত হবে। তিনি তাঁর নিবন্ধ সংগ্রহে সুশ্রুতসহ ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ভুক্ত পূর্বাচার্যদের মত সুললিত সংস্কৃত ভাষায় নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ডল্বণ সর্বমত সংগ্রাহক হলেও তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও স্বমত প্রতিষ্ঠায় বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেছেন। সুশ্রুতের জটিল অংশগুলির ব্যাখ্যায় তাঁর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। [৩৫]

অধুনা প্রাপ্তব্য চরক টীকাকারদের মধ্যে আচার্য চক্রপাণি দত্তের নাম চিরস্মরণীয়। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর রচিত চরক টীকার নাম 'আয়ুর্বেদ দীপিকা'। এছাড়া তিনি সুশ্রুতের ওপর 'ভানুমতী' টীকা, চিকিৎসকদের সুবিধার জন্য চরক সুশ্রুত ও বাগ্‌ভট কথিত ঔষধাবলীর স্বনামে সংগৃহীত 'চক্রদত্ত সংহিতা', দ্রব্য পরিচয়ের জন্য 'দ্রব্যগুণ সংগ্রহ' রচনা করেন। অভিধান ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞান সুসম্পন্ন হয় না বলে চক্রদত্ত 'শব্দচন্দ্রিকা' নামে একটি আয়ুর্বেদীয় অভিধান রচনা করেন। চক্রদত্তের লিখিত অপর তিনটি পুস্তকের নাম সর্বসার সংগ্রহ, চিকিৎসাস্থান টিপ্পনী ও ব্যগ্রদরিদ্র শুভঙ্কর। [৩৬] 'চিকিৎসাসার সংগ্রহ' গ্রন্থে বৃন্দের সিদ্ধযোগ থেকে বেশিরভাগ অংশ গ্রহণ করেছেন বলে চক্রদত্ত উল্লেখ করেছেন। [৩৭] 'চক্রসংগ্রহ' এ মাধব লিখিত রোগাধিকারের পর্য্যায় অনুযায়ী ঔষধাবলীর সন্নিবেশ আছে। আত্রেয় সম্প্রদায়ভুক্ত বৈদ্যদের লৌহপ্রাচীর ভেদ করে নিজ সংগ্রহে তিনি রসবৈদ্যদের

প্রচারিত সিদ্ধ ভেষজ সমূহের সন্নিবেশ ঘটান। তিনি নিজ গ্রন্থে রস চিকিৎসার কতকগুলি শ্রেষ্ঠ ঔষধ যথা - রসপর্পটিকা, তাম্রযোগ, অভ্রযোগ প্রভৃতি সন্নিবেশিত করেছিলেন। ভানুমতীতে চক্রপাণি ডল্বণের মত খণ্ডন করেছেন, তাই তাঁকে ডল্বণের পরবর্তী বলা যায়।[৩৮]

চরক ও সুশ্রুতকে আচার্যরূপে গ্রহণ করে চক্রপাণি যেমন তাঁদের অনুবর্তন করেছেন, তেমনি বাগ্ভটের চিকিৎসাসূত্র ও বাগ্ভট নির্দিষ্ট সংগ্রহের মধ্যে বহু অংশের উদ্ধার তিনি নিজ গ্রন্থে করেছেন। চরক, সুশ্রুত ও বাগ্ভটের সমন্বয়সূত্র যে দোষধাতুমলতত্ত্বে পরিস্ফুট, তিনি তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা চরকের গ্রহণী চিকিৎসার শ্লোক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে করেছেন। চক্রপাণিকৃত সংগ্রহগ্রন্থ 'চক্রদত্ত' এবং 'দ্রব্যগুণ সংগ্রহ' আয়ুর্বেদের একটি নিজস্ব বৈজ্ঞানিক রূপের সন্ধান দিয়েছে। সুতরাং তাঁকে আকর গ্রন্থের টীকাকার না বলে ঐতিহাসিক যুগের মৌলিক ঋষিকল্প আয়ুর্বেদবিজ্ঞানাচার্য বলে অভিহিত করা যায়। অধিকন্তু রসতন্ত্রের সঙ্গে বনৌষধির সমন্বয়ে যে যুগান্তর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে, তার প্রথম পথপ্রদর্শক হলেন চক্রপাণি দত্ত। [৩৯]

বঙ্গসেন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তিনি লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক ছিলেন বলে মনে করা হয়। বঙ্গসেনের 'চিকিৎসাসার সংগ্রহ' একটি উল্লেখযোগ্য আয়ুর্বেদ গ্রন্থ। রোগবিদ্যার ওপরে সাধারণ আলোচনা, বৈদ্যের কর্তব্য, রোগ ও তার চিকিৎসার বর্ণনা তিনি বিশদভাবে করেছেন। রসায়ন, বাজীকরণ, বৃংহণ, স্বেদন, বমন ও ঔষধ সংক্রান্ত বিজ্ঞানসহ রোগ নির্ণয় ও রোগের পূর্বাভাস সম্পর্কে এই গ্রন্থে আলোচনা আছে। তাছাড়া এতে অর্শরোগ ও তার চিকিৎসার পৃথক আলোচনা আছে। তিনি তিনপ্রকার লৌহ, ছয়প্রকার ইস্পাতের শুদ্ধিকরণ, লৌহের মারণ ও চূর্ণ, পারদের শুদ্ধিকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ব্যাধি ও অরিষ্ঠাদি বর্ণনায় মাধবনিদান, সুশ্রুত ও বাওয়ার পাণ্ডুলিপির প্রভাব দেখে গ্রন্থকারকে একজন সংগ্রাহক বলা যায়। [৪০]

গ্রীয়ারসন শার্ঙ্গধর সংহিতার রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ১৫০০ অব্দ বলে মনে করেছেন। কিন্তু শার্ঙ্গধর সংহিতার টীকাকার বোপদেবের (প্রায় ১৩০০ খ্রীঃ) রচনা থেকে বোঝা যায় যে, শার্ঙ্গধর সংহিতার রচনা তার পূর্বেই হয়েছিল।[৪১] শার্ঙ্গধরের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের শেষ থেকে ত্রয়োদশ শতকের সূচনা বলে শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য মনে করেন।[৪২] শার্ঙ্গধর রচিত 'শার্ঙ্গধর সংগ্রহ' একটি ঔষধ সংগ্রহ গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা - পূর্ব, মধ্য ও উত্তর খণ্ড। এগুলিতে যথাক্রমে সাত, বারো ও তেরোটি খণ্ড বিদ্যমান। এই গ্রন্থে রোগানুসারে ঔষধ সন্নিবেশের পরিবর্তে কল্পনা অনুসারে অর্থাৎ স্বরস, ক্বাথ, কল্ক, চূর্ণ, গুড়িকা ইত্যাদি ক্রমে ঔষধ সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি চিকিৎসাকার্যে চক্রদত্তের সমন্বয়তত্ত্বই অনুবর্তন করেছেন এবং দোষধাতুমল তত্ত্বের সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠা করেছেন। [৪৩]

ভারতে মুসলমান শাসকদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে দেশে ব্যাপক রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পটপরিবর্তন ঘটে। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান চিকিৎসকরা ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতি ভারতে প্রচলন করতে থাকেন। শাসকশ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতি ভারতীয় জনজীবনে যখন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল তখন দেশে আয়ুর্বেদ চর্চার প্রকৃত অবস্থার বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য দেখা যায়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার আয়ুর্বেদের প্রতি মুসলমান শাসকদের ঔদাসীন্যকে "passive neglect of Ayurveda" বলে মন্তব্য করেছেন।[৪৪] আবার একইভাবে আর.এন. চোপড়া মনে করেন যে, "With the advent of Muslim conquerers the decline was more rapid. The Hindu Ayurvedic system of treatment was rapidly thrown into the background". [৪৫] কিন্তু ঐতিহাসিক এ.এল. ব্যাসামের মতে, "The practitioners of these two systems seems to have collaborated because, each had much to learn from others, we have no record of animosity between Hindu and Muslim in the field of medicine." [৪৬]

মুসলমান শাসকদের রাজত্বকালে আয়ুর্বেদ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছিল অথবা ইউনানীর মত সমানভাবে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল — কোনো মতই সম্পূর্ণ সঠিক নয়। কারণ সুলতানী আমলে আয়ুর্বেদ কিছুটা উপেক্ষিত হলেও মুঘলযুগে এটি রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হয়েছিল। এই যুগেই আয়ুর্বেদ ও ইউনানীর মধ্যে পারস্পারিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে ইউনানীতিব্বির প্রচলন হয়। এর ফলে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার বিষয়টি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। মুঘল আমলে ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা উভয় পদ্ধতির এক সঙ্গে বিকাশ ঘটতে থাকে।

মুঘল যুগে সংখ্যার দিক থেকে পারসীক চিকিৎকরা সবচেয়ে বেশী ছিলেন। তারপর ক্রমশঃ ভারতীয় ও অন্যান্য চিকিৎসকদের সংখ্যার দিক থেকে অবস্থান ছিল। বিদেশী লেখকদের

প্রদত্ত বিবরণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি নিম্নলিখিত সারণী থেকে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায় [৪৭] —

সম্রাট	পারসিক	ভারতীয়	অন্যান্য	মোট
আকবর	১৫	১৪	১৩	৪২
জাহাঙ্গীর	১১	০৭	০১	১৯
শাহজাহান	১০	০৮	০৫	২৪
ঔরঙ্গজেব	০৪	?	০১	?

আবুল ফজল ও নিজামুদ্দিনের প্রদত্ত চিকিৎসকদের তালিকা থেকে বোঝা যায় যে, আকবরের আমলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু তবীব ছিলেন।[৪৮] তাই বলা যায় যে অন্যান্য মুঘল বাদশাহদের তুলনায় আকবরের সময়ে অবস্থা ভিন্নতর ছিল। হিন্দু তবীবরা তিব্ব নয়, আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আকবরের রাজত্বকালে কবিচন্দ্র, বিদ্যারাজা, তোডরমল ও নীলকণ্ঠ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। [৪৯]

ঐতিহাসিক আস্কারী হিন্দু চিকিৎসকরূপে আকবরের আমলের মহাদেব, ভীম, নাথ, নারাইন (নারায়ণ?), ঔরঙ্গজেবের আমলের হিন্দু তবীব শিউজী এবং মহম্মদ শাহের আমলের সুখরাজের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, স্যার জন মার্শালের জার্নাল (স্যার শফাৎ খান সম্পাদিত) থেকে হুগলীর নীলকণ্ঠ এবং পাটনার বৈজনাথ ও শিউগোবিন্দের কথা জানা গেছে। এই সূত্র থেকে ৭ই নভেম্বর, ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে শোথরোগ, গেঁটেবাত, অশ্মরী, উপদংশ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় পাটনার হিন্দু চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্রের কথাও জানা গেছে।[৫০]

সুলতানী ও মুঘল আমলের দলিল দস্তাবেজ, সাহিত্যিক উপাদান ও অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, সেকালে বিপুল সংখ্যক চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখিত, অনূদিত ও সংগৃহীত হয়েছিল। তাছাড়া এই সময়ে বহু ভাষ্যগ্রন্থও রচিত হয়েছিল। পারসীক সূত্র থেকেও মুঘলযুগের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বহু তথ্য জানা যায়। বিভিন্ন ভাষায় রচিত চিকিৎসা

বিষয়ক গ্রন্থগুলির সংখা সারণীর [৫১] মাধ্যমে প্রদর্শিত হল ঃ—

শতক (খ্রীঃ)	পারসিক	আরবী	সংস্কৃত	মোট
ত্রয়োদশ	০৪	০৪	৩১	৬৮
চতুর্দশ	২১	০৫	৫০	৭৬
পঞ্চদশ	১৮	০১	৩৬	৫৫
ষোড়শ	১২০	১০	৬১	১৯১
সপ্তদশ	১০২	১২	১২২	২৩৬
অষ্টাদশ	১৩৩	০৬	৮০	২১৯

উপরে দেওয়া সারণীর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীকালে অর্থাৎ সুলতানী আমলের অনুপাতে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকে অর্থাৎ মুঘল যুগে চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকে সংস্কৃত ভাষায় প্রচুর সংখ্যক চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে মুসলমান শাসনকালে ইউনানীর পাশাপাশি আয়ুর্বেদের ধারা প্রবহমান ছিল। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ — অষ্টাদশ শতকে মুঘল শাসনকালে রচিত উল্লেখযোগ্য আয়ুর্বেদ গ্রন্থগুলি নিম্নে তালিকার আকারে প্রকাশ করা হল[৫২]—

লেখকের নাম	আয়ুর্বেদ গ্রন্থের নাম	প্রকাশকাল
ভাবমিশ্র	ভাবপ্রকাশ	১৫৫৮ — ৫৯ খ্রীঃ
তোডরমল	তোড়রানন্দ	১৫৮৯ খ্রীঃ
জগন্নাথ	যোগসংগ্রহ	১৬১৬ খ্রীঃ
মণিরাম মিশ্র	বৃত্তরত্নাবলী	১৬৪১ খ্রীঃ
কবিচন্দ্র	চিকিৎসা রত্নাবলী	১৬৬১ খ্রীঃ
জৈনহর্ষকীর্তিসূরী	যোগচিন্তামণি বৈদ্যকসারসংগ্রহ	১৬৬৬ - ৬৮ খ্রীঃ

লেখকের নাম	আয়ুর্বেদ গ্রন্থের নাম	প্রকাশকাল
বিদ্যাপতি	বৈদ্যরহস্য	১৬৮২ খ্রীঃ
রঘুনাথ পণ্ডিত	বৈদ্যবিলাস	১৬৯৭ খ্রীঃ
বৈদ্যরাজ	সুখবোধ	১৭০২ খ্রীঃ
মাধব	আয়ুর্বেদ প্রকাশ	১৭১৩ খ্রীঃ
ত্রিমল্ল	যোগতরঙ্গিনী	১৭৫১ খ্রীঃ

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ হল ভাবিমিশ্র রচিত ভাবপ্রকাশ। ভাবপ্রকাশ রচয়িতা ভাবমিশ্রের প্রকৃত নাম ভবনাথ মিশ্র।[৫৩] তাঁর বংশপরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ভাবমিশ্র নিজেকে 'শ্রীমিশ্রলটকন তনয়' বলেছেন।[৫৪] ভাগবত সিংহ্জীর মতে মদ্রদেশে ভাবমিশ্রের জন্ম হয়েছিল।[৫৫] কিন্তু অশোক কুমার বাগচী তাঁকে কনৌজবাসী বলেছেন।[৫৬] আবার ঐতিহাসিক দীপক কুমার তাঁকে বেনারসবাসী মনে করেছেন। [৫৭]

ভাবমিশ্র ছিলেন আত্রেয় সম্প্রদায়ভুক্ত একজন প্রখ্যাত কায়চিকিৎসক। চরক, সুশ্রুত ও বাগ্ভট এই বৃদ্ধত্রয়ীর পর মাধবকর, শার্ঙ্গধর ও ভাবমিশ্র এই লঘুত্রয়ীর আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু বাগ্ভটের পর এবং ভাবমিশ্রের পূর্বে আর কোনো অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ রচয়িতার আবির্ভাব ঘটেনি। এমনকি ভাবমিশ্রের পরবর্তীকালে সাড়ে চারশ' বছরেরও বেশি সময়কালে তাঁর তুল্য আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ দেখা যায় না। ভাবমিশ্র তাঁর গ্রন্থের উৎকর্ষ বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই তিনি নিজ গ্রন্থের উত্তরখণ্ডের সমাপ্তিতে লিখেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত অম্বরপথে সূর্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল অবস্থান করবে, সপ্তসমুদ্র ও পর্বতসমূহ ভূপৃষ্ঠে থাকবে, ফণিরাজের ফণামণ্ডলে পৃথিবী অবস্থান করবে ততদিন পর্যন্ত সৎ বৈদ্যদের পক্ষে এই মঙ্গলকর ভাবপ্রকাশ গ্রন্থ পাঠের উপযোগী থাকবে। [৫৮]

জ্ঞাত-অজ্ঞাত বহু আয়ুর্বেদাচার্যের সাধনায় পুষ্ট হয়ে আয়ুর্বেদশাস্ত্র বিপুলায়তন ও জটিল হয়ে পড়ে। এককভাবে এই বিশাল শাস্ত্রের সম্পূর্ণ জ্ঞান আয়ত্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া আয়ুর্বেদের সাঙ্কেতিক শাস্ত্র ও চিকিৎসা গ্রন্থগুলি বেশীরভাগই জটিল সংস্কৃত ভাষায় রচিত। তাই এই গ্রন্থগুলি পাঠ করতে হলে সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ভাবপ্রকাশের সংস্কৃত সহজ ও প্রাঞ্জল। এই গ্রন্থ থেকে ধন্বন্তরি, আত্রেয়, চরক প্রমুখের আবির্ভাব; সৃষ্টিপ্রকরণ; শারীরতত্ত্ব; স্বস্থবৃত্তি; পরিভাষা; দ্রব্যগুণ; বিভিন্ন ধাতুর শোধন ও মারণবিধি; পঞ্চকর্ম; পঞ্চনিদান এবং রোগসমূহের নিদান ও চিকিৎসা সহ আয়ুর্বেদীয় সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা যায়। চরক,

সুশ্রুত, মাধব প্রমুখের রচিত পুস্তক পাঠ করলেও অন্য পুস্তক পাঠের আবশ্যকতা থাকে। কিন্তু যেহেতু ভাবপ্রকাশ ঐ সমস্ত গ্রন্থের সারসংগ্রহ, তাই ভাবপ্রকাশ পাঠ করলে ঐ গ্রন্থগুলি পাঠের ফল পাওয়া যায়। তাঁর গ্রন্থটিকে একটি জ্ঞানভাণ্ডার বলা যায়। [৫৯]

ভাবমিশ্র অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের সংগ্রাহক তো ছিলেনই, সেইসঙ্গে বাগ্‌ভটের পরবর্তীকালে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদে যে সব নূতন ও মূল্যবান বিষয় আহরিত হয়েছিল, তাও তিনি নিজ গ্রন্থে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করেছিলেন। কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বলেছেন যে, "Though based upon works of preceeding authors, yet it gives much additional information about the properties of some new drugs. Some new drugs also are mentioned and some new diseases." [৬০] এই গ্রন্থে রসোপরস, বিবিধ ধাতু, অহিফেন, তোপচিনি প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহারের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থটি থেকে ফিরঙ্গ, মসূরিকা, শীতলা প্রভৃতি রোগের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা যায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দেখিয়েছেন যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ভারতবর্ষে পোর্তুগীজদের আগমনের এবং উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে ফিরঙ্গারোগ প্রভৃতি কতকগুলি নূতন ব্যাধির প্রসার হয়েছিল। চরক, সুশ্রুত থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে চিকিৎসকরা উপদংশ রোগের চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু ফিরঙ্গ বা সিফিলিস বলতে যে ব্যাধি বোঝায় সে বিষয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি।[৬১]

স্যার ম্যালকম মরিস বলেছেন যে, "Syphilis was not known to Europe before 1500 A.D." তারপর তিনি বার্লিনের প্রফেসর আইওয়ান ব্লকের "System of Syphilis" থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, "In the entire literature of the old world both Occidental and Oriental, no description of the Syphilitic syndrome anterior to the year 1495 is to be met with. [৬২]

গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও মনে করেছেন যে, চরক ও সুশ্রুতে ফিরঙ্গারোগ অজ্ঞাত ছিল। ভাবপ্রকাশে এর প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। তাঁর পূর্ববর্তী সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন রকম যৌনরোগের উল্লেখ থাকলেও সেগুলি সিফিলিস নয়।[৬৩] ভাবমিশ্র ফিরঙ্গ রোগের চিকিৎসা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, পূর্বকালের চিকিৎসকদের মতে রসকর্পূর নামক ঔষধ প্রয়োগ করলে নিশ্চয়ই ফিরঙ্গারোগ আরাম হয়।[৬৪] অর্থাৎ তাঁর পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের কাছে এই রোগ অজ্ঞাত ছিল না। তবে এই চিকিৎসক কারা তা জানা যায় না, তবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় হিন্দু চিকিৎসা

পদ্ধতিতে 'রসপ্রদীপ' নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম ফিরঙ্গ রোগের উল্লেখ আছে বলে মনে করেন।[৬৫] ফিরঙ্গ চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভাবমিশ্র কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ফিরঙ্গরোগীর গাত্রস্পর্শ এবং বিশেষ ফিরঙ্গিনীর সঙ্গে সংসর্গকে তিনি ফিরঙ্গ নামক গন্ধরোগের কারণ বলে নির্ণয় করেছেন। এই রোগের ফলে কৃশতা, বলক্ষয়, নাসাভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিবক্রতা ইত্যাদি ঘটে। ভাবমিশ্র এই ব্যাধিটিকে বাহ্য, অভ্যন্তর এবং বহিরন্তর্ভব — এই তিনভাগে ভাগ করেছেন। অল্পদিনজাত ও নিরুপদ্রব বাহ্যফিরঙ্গ সাধ্য, অভ্যন্তর ফিরঙ্গ কষ্টসাধ্য, বহিরন্তর্ভব ফিরঙ্গে শরীর ক্ষয় না হলে তা সাধ্য হয়। এই রোগের চিকিৎসার জন্য তিনি পারদঘটিত ঔষধ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।[৬৬]

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখা থেকে জানা যায় যে, ফ্লুকিগার ও হ্যানবেরীর মতে ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে চৈনিক ব্যবসায়ীগণ গোয়াবাসী পর্তুগীজদের নিকট ফিরঙ্গ রোগের ঔষধ হিসাবে পারদঘটিত ক্যালোমেল ও যবচিনির ব্যবহারবিধি প্রচার করেন। আচার্য রায় আরো বলেছেন যে, অজৈব অম্ল 'শঙ্খদ্রাবক' এর কোনো উল্লেখ ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে নেই। বলাবাহুল্য ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে অজীর্ণ, প্লীহা এবং যকৃতের ব্যাধির জন্য শঙ্খদ্রাবকের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। ভাবমিশ্র কিন্তু অম্লস্বাদের ফলের রস ব্যতীত অন্য কোনো অম্ল ব্যবহারের নির্দেশ দেননি।[৬৭] ভাবমিশ্র পারদকে ধাতু হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাপমান যন্ত্রের আবিষ্কারের বহু পূর্বেই তিনি ধারণা করেছিলেন যে, পারদ বদ্ধ হলে তাপ পরিমাপে সমর্থ হয়।[৬৮] তিনি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতই বিষকে শোধন করে 'বিষস্য বিষমৌষধি' রূপে ব্যবহারের কথা বলেছেন।[৬৯] ভাবমিশ্র তৎকালে ভারতে উপলব্ধ বিদেশ থেকে আগত নানা ফল ও দ্রব্যকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর পূর্বকালে রচিত আয়ুর্বেদ গ্রন্থসমূহে অনুল্লিখিত তোপচিনি; বদখশান, কাবুল ও মুগ্গলদেশের নাসপাতি; খোরাসানি ও পারসীক বচ এবং সুলেমানি খর্জ্জুরকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করেছেন।[৭০] মুঘল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ভাবমিশ্রের রচনায় ভারত ও তার প্রতিবেশী দেশসমূহের উল্লেখ থাকাই স্বাভাবিক। আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরা সাধারণতঃ পরম্পরাগত চিকিৎসা পদ্ধতি ও ঔষধ প্রয়োগ করেন। এক্ষেত্রে ভাবমিশ্র অনেকটা মুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন।

ভাবপ্রকাশের সমালোচনা করে বলা যায় যে, এখানে শল্য, শালাক্য ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধযুগের শেষ পর্যায় থেকেই এগুলির চর্চা ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছিল। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার চর্চার মত ধীশক্তি সম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্যের সংখ্যাও ছিল কম। তাই ভাবমিশ্র রোগের নিদান, চিকিৎসা ইত্যাদি আয়ুর্বেদ

শাস্ত্রের নানাবিধ জ্ঞানকে সহজ ভাষায় সরল, ভঙ্গীতে সন্নিবেশিত করে সমকালীন ও পরবর্তী আয়ুর্বেদাচার্যদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতে যুক্তিবাদী চিকিৎসাশাস্ত্রের যে ধারা আয়ুর্বেদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল খুব ব্যাপকভাবে না হলেও সেই ধারা মধ্যযুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত মহাপুরাণগুলিতে কিভাবে এই যুক্তিবাদের প্রতিফলন ঘটেছিল তা পর্যালোচনা করা হবে।

সূত্রনির্দেশ

(১) গণনাথ সেন, আয়ুর্বেদ পরিচয়, কলিকাতা, ১৩৫১ সাল, পষ্ঠা - ৬—৭

(২) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৩ — ৩৪

(৩) P. Kutumbia, Ancient Indian Medicine, Madras, 1962, P. XXX

(৪) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, আয়ুর্বেদের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭০ সাল, পৃষ্ঠা- ৪৯

(৫) অনিল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৫১৯ - ৫২১

(৬) J. Filliozat, Classical Doctrine of Indian Medicine: Its Origin and Greek Parallels, traslated by Dev Raj Chanana, Delhi, 1964, p.- 21

(৭) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫০ - ৫৩

(৮) অনিল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৫২৩

(৯) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৯

(১০) অনিল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৭ - ৯

(১১) K.K. Dutta, 'Scientific Literature in Sanskrit', The Cultural Heritage of India, Vol - V, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, 2001, p.- 353

(১২) বিজয়কালী ভট্টাচার্য, 'আয়ুর্বেদের ইতিহাস', আশিসকুমার মল্লিক সম্পাদিত, আয়ুর্বেদ সংকলন : ১, কলিকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা - ২২

(১৩) P. Kutumbia, op. cit., p. - XIX

(১৪) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১৪০

(১৫) H.R. Zimmer, Hindu Medicine, Baltimore, 1948, pp.- 90-91

(১৬) বিজয়কালী ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২৭ — ২৮

(১৭) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৭৯ - ৮১

(১৮) বিজয়কালী ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৩০ - ৩১

(১৯) K.K. Dutta, op.cit., p. - 354

(২০) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৯৪ - ৯৫

(২১) তদেব, পৃষ্ঠা ৯৫ - ৯৭

(২২) কালীকিঙ্কর সেনশর্মা ও সত্যশেখর ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বাগ্‌ভট বিরচিত অষ্টাঙ্গ-হৃদয়, কলিকাতা, ১৪০৭, দ্বিতীয়খণ্ড, উত্তরস্থান, অধ্যায় - ৪০, শ্লোক - ৪৮-৪৯

(২৩) বাগ্‌ভট, অষ্টাঙ্গহৃদয়, দ্বিতীয়খণ্ড, উত্তরস্থান, অধ্যায় - ৪০, শ্লোক - ৪৬

(২৪) Julius Jolly, Indian Medicine, New Delhi, 1977, p.-11

(২৫) Vijay Kumar Thakur, "Surgery in Early India : A Note on the Development of Medical Science", in Deepak Kumar (ed.), Disease and Medicine in India A Historical Overview, New Delhi, 2001, p.-17

(২৬) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০১-১০৩

(২৭) আশিসকুমার মল্লিক সম্পাদিত, মাধবকর বিরচিত নিদান, কলিকাতা, ২০০০, ভূমিকা দ্রষ্টব্য

(২৮) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৪-১১৫

(২৯) মাধবকর, নিদান, অধ্যায় - ১, শ্লোক - ৩

(৩০) মাধবকর, নিদান, অধ্যায় - ১, শ্লোক - ৪-১০

(৩১) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা- ৪১, ১৮৮

(৩২) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, আয়ুর্বেদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ১২২

(৩৩) Julius Jolly, op.cit., p. - 8

(৩৪) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, আয়ুর্বেদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ১২৪

(৩৫) তদেব, পৃষ্ঠা ১৪৩-১৪৪

(৩৬) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, আয়ুর্বেদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৭১-৭২

(৩৭) Julius Jolly, op.cit., p. - 7

(৩৮) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, আয়ুর্বেদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ৭২—৭৩

(৩৯) বিজয়কালী ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৩৪

(৪০) Julius Jolly, op.cit., pp. 6-7

(৪১) Ibid., p.-5

(৪২) বিজয়কালী ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৩৪

(৪৩) তদেব

(৪৪) Ramesh Chandra Majumder, 'Medicine' in Bose, Sen and Subbarayappa (ed.), A concise History of Science in India, Delhi, 1971, pp.- 262-264

(৪৫) R.N. Chopra, Indigenous Drugs in India, Calcutta, 1933, p.- 5

(৪৬) A.L. Basham, 'Practice of Medicine in Ancient and Medieval India', in Charles Leslie (ed.), Asian Medical Systems : A Comparative Study, Vol- III, Delhi, 1998, p.- 40

(৪৭) S. Ali Nadeem Rezavi, 'Physicians as Professionals in Medieval India', in Deepak Kumar (ed.), Disease and Medicine in India A Historical Overview, New Delhi, 2001, p - 42

(৪৮) Ibid.

(৪৯) R.L. Verma and N.H. Keswari, 'Unani Medicine in Medieval India - Its Teachers and Texts', in N.H. Keswani (ed.), The Science of Medicine and Physiological Concept in Ancient and Medieval India, New Delhi, 1974, p.- 134

(৫০) S.K. Askari, 'Medicines and Hospitals in Muslim India', in Journal of the Bihar Research Society, Vol - XLIII, Part I and Part II, March - June, 1957, Patna, p. - 15

(৫১) S. Ali Nadeem Rezavi, op.cit., p. - 55

(৫২) Julius Jolly, op.cit., p. 2-3

(৫৩) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১৫৭

(৫৪) কালীকিঙ্কর সেনশর্মা ও সত্যশেখর ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, ভাবমিশ্র বিরচিত ভাবপ্রকাশ, পূর্বখণ্ড, কলিকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা - ১৬

(৫৫) H.H. Bhagvat Sinhjee, History of Hindu Medical Science, New Delhi, 1998, p. -36

(৫৬) Ashoke Kumar Bagchi, Medicine in Medieval India : 11th to 18th Centuries, Delhi, 1997, p. - 70

(৫৭) Deepak Kumar (ed), Disease and Medicine in India A Historical Overview, New Delhi, 2001, p. xvii (introduction)

(৫৮) কালীকিঙ্কর সেনশর্মা ও আয়ুর্বেদাচার্য সত্যশেখর ভট্টচার্য সম্পাদিত, ভাবমিশ্র বিরচিত ভাবপ্রকাশ, কলিকাতা, ২০০১, উত্তরখণ্ড, পৃষ্ঠা - ২৫৬

(৫৯) H.H. Bhagvat Sinhjee, op.cit., p.-37

(৬০) Nagendra Nath Sengupta, The Ayurvedic System of medicine, or an Exposition in English of Hindu medicine as accuring in Charak, Susruta works ancient and modern, in Sanskrit,Vol-II, New Delhi, 1984, pp.-VIII and IX of the preface

(৬১) অনিল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৫৪৬

(৬২) V.W. Karambelkar, The Atharva Veda and the Ayurveda, Nagpur, 1961, pp.-193

(৬৩) Girindra Nath Mukhopadhyaya, History of Indian Medicine, Vol - I, Calcutta, 1923, p.-132-135

(৬৪) ভাবমিশ্র বিরচিত ভাবপ্রকাশ, পূর্বোক্ত, মধ্যখণ্ড, চতুর্থভাগ, পৃষ্ঠা - ৬২

(৬৫) অনিল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৫৪৬

(৬৬) ভাবমিশ্র বিরচিত ভাবপ্রকাশ, পূর্বোক্ত, মধ্যখণ্ড, চতুর্থভাগ, পৃষ্ঠা - ৬১-৬৩

(৬৭) অনিল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৫৪৬-৫৪৭

(৬৮) ভাবমিশ্র বিরচিত ভাবপ্রকাশ, পূর্বোক্ত, পূর্বখণ্ড, পৃষ্ঠা - ২৭৭

(৬৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৮৮

(৭০) H.H. Bhagvat Sinhjee, op.cit., p. - 38